ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1124-1130
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.330

বিধবাদের ব্রত পালন: বাঙালি সমাজে ধর্ম, লিঙ্গ ও সামাজিক শাসন

অমরেন্দ্র প্রধান, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ রিসার্চ সেন্টার, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 14.03.2026; Accepted: 16.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper discusses the ritual of *brata* (religious vows) among the Hindu widows in Bengali society and how it fits into the larger category of gendered, religious, and socially regulated practices in the Bengali society. *Brata* has been a significant mode of religious observance mostly among women in the cultural life of Bengali. But these rituals were not equally experienced. Whereas married women undertook vows in pursuit of household prosperity, marital well-being and family stability, widows were frequently subjected to more severe types of ritual discipline. Widow centered vows like *Ekadashi*, *Ambubachi*, and other related practices, controlled the daily life and social status of widowed women who were required to live under the influence of prolonged starvation, dietary restraints, ritual silence and deprivation of bodily pleasures. Based on the analysis of autobiographical accounts, literary sources, and historical debates, this paper will claim that these rituals functioned not just as a way of religious devotion but also as a means of cementing patriarchal rules. Meanwhile, to most widows the practices offered a system of spiritual sense and ethical respect under circumstances of social marginalization. The analysis of these overlapping dimensions demonstrates how the traditions of widow-centred brata help understand the multifactorial connection between the field of religious practice, gendered disciplines, and social authority in the cultural history of Bengal.

Keywords: Brata Rituals, Widowhood in Bengal, Patriarchal Social Control, Religious Asceticism, Gender and Ritual Practices, Bengali Folk Culture

'ব্রত' শব্দটি 'বৃ' ধাতুর সঙ্গে 'অত্' প্রত্যয় যোগে সম্পন্ন হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে- "কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।"[১] ড. শীলা বসাক বলেছেন- "সাধারণত কিছু কামনা করে দেবতার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানিয়ে কোন বিশেষ আচরণ পালন বা অনুষ্ঠান করা কিংবা পার্থিব কল্যাণ কামনায় দশে মিলে যে সামাজিক নিয়ম বা অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকেই ব্রত বলা হয়"।[২] আবার সংসদ বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে ব্রত হল- "পুণ্য লাভ ইষ্টলাভ পাপক্ষয় প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠান ধর্মকার্য, ধর্মানুষ্ঠান; তপস্যা; সংযম"।[৩] অর্থাৎ ব্রত হল- মানুষের কামনা ও সেই কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত আচরণ সমষ্টি। বাঙালি সমাজে ব্রতপ্রথার উৎপত্তি কেবল শাস্ত্রীয় ধর্মাচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর শিকড় আরো প্রাচীন লোকাচার ও মানব সমাজের আদিম অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে বিধবাদের অবস্থান ছিল সর্বদাই প্রান্তিক ও পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও ধর্মীয় অনুশাসন বিধবাদের জীবনকে আবদ্ধ করেছিল কঠোর সংযম ও বিধি-নিষেধের বেড়াজালে। উনিশ শতকের জনগণনা অনুযায়ী বাংলায় বিধবাদের সংখ্যা ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাধিক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মোট নারীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ।[৪] এই বিপুল সংখ্যক বিধবাদের উপস্থিতি পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা সৃষ্ট শাস্ত্রীয় বিধান, ব্রত ও সংযমমূলক অনুশীলনকে কেবল ব্যক্তিগত ধর্মাচারণ নয়, বরং একটি ব্যাপক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় পরিণত করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে ব্রত পালন ছিল এমন এক অনুশীলন যার মাধ্যমে বিধবাদের দৈহিক আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ও নৈতিক পরিচয় নির্ধারণ করা হতো।

ব্রতের গঠন ও প্রকৃতির ভিত্তিতে এগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা শাস্ত্রীয় ব্রত ও অশাস্ত্রীয় ব্রত। শাস্ত্র, পুরাণ এবং ব্রাহ্মণ্য আচার পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত ব্রত গুলিকে শাস্ত্রীয় ব্রত বলা হয়। এগুলিতে মন্ত্রপাঠ, সংকল্প, ঘটস্থাপন, ব্রাহ্মণকে দান ইত্যাদি নিয়মাবলী অনুসরণ করা হয়। এই ব্রতগুলির কাঠামো তুলনামূলকভাবে সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত।[৫] আবার অশাস্ত্রীয় ব্রতগুলির মধ্যে নারী ব্রতকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যথা- কুমারী ব্রত, সধবা ব্রত ও বিধবা ব্রত। কুমারী ব্রতগুলি মূলত অল্প বয়সী মেয়েদের দ্বারা পালিত হয় এবং এগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ ও লৌকিক প্রকৃতির। এখানে মন্ত্র বা পুরোহিতের ভূমিকা প্রায় অনুপস্থিত, তার চেয়ে আলপনা, প্রতীকি ক্রিয়া এবং ছড়ার মাধ্যমে কামনা প্রকাশ বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই ব্রতগুলিকে বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৬] সধবা ব্রতগুলি শাস্ত্রীয় ও লৌকিক উপাদানের মিশ্রণ, এগুলি বিবাহিত নারীদের দ্বারা পালিত হয়। গৃহস্থলীর মঙ্গল, সন্তানের কল্যাণ এবং পারিবারিক সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত এই ব্রতগুলিতে শাস্ত্রীয় আচার থাকলেও তা অনেকক্ষেত্রে সহজীকৃত ও রূপান্তরিত।[৭] স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা যে ব্রতগুলি পালন করে থাকেন তাকে বিধবা ব্রত বলা হয়। মূলত পাপ মুক্তি, পূর্ণ অর্জন, নরকবাস থেকে মুক্তি ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির আশায় বিধবারা এই ব্রতগুলি পালন করতেন। তুলনামূলক ভাবে বিধবাদের ব্রতগুলি ছিল খুব কঠিন। বহু ক্ষেত্রেই বিধবারা সমাজের লাল চোখ এড়াতে এই কঠিন ব্রতগুলি পালন করতে বাধ্য হতেন। হিন্দুমতী দেবী তার বৈধব্য জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন- অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার পর বাপের বাড়িতে এসে ডুরে কাপড় গয়নাগাটি পরে খোঁপা বেঁধে বেড়াতেন, চুলে সোনার চিরুনি-ফুলকাটা সবই দিতেন। এই দেখে তাদের পাড়ার ঘোষেদের মেয়ে এসে ব্যঙ্গ করে বলেছিল-

"তোর ভাতার মরেছচে। ১২/১৪ বছরের ধাড়ি হলি, একাদশী করবি কবে?
মা তো খুব সোহাগিনী সাজিয়ে রেখেছে। সিঁদুর পরবে কবে লো?"[৮]

সাধারণত নারী ব্রত কে নারীদের ধর্মীয় আচার হিসেবে দেখা হলেও, সব ব্রত সকল নারীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল না। এই নারী ব্রত প্রথাগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল সাধারণ ব্রত এবং বিধবা কেন্দ্রিক ব্রত। সাধারণ ব্রত প্রধানত বিবাহিত নারীদের দ্বারা পালিত হতো এবং এগুলির উদ্দেশ্য ছিল স্বামীর মঙ্গল, সন্তানের কল্যাণ এবং গৃহস্থলীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। যেমন - লক্ষী ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, শীতলা ব্রত বা বিভিন্ন পৌষ-পার্বণ কেন্দ্রিক ব্রত। এই ব্রতগুলিতে খাদ্য প্রস্তুতি, পূজা ও ভোগ নিবেদনের আচারগুলি গৃহস্থালি জীবনের সঙ্গে তাদের একটি ইতিবাচক ও ধারাবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করে। অন্যদিকে বিধবা কেন্দ্রিক ব্রত মূলত সংযম, বর্জন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে গঠিত। একাদশী, অম্বুবাচী, মাঘব্রত, মৌনী অমাবস্যা প্রভৃতি ব্রতের ক্ষেত্রে উপবাস, স্বল্প আহার, নীরবতা এবং দৈহিক সুখ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে বিধবাদের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখানে 'মঙ্গল' বা 'সমৃদ্ধি'র পরিবর্তে 'পবিত্রতা' ও 'সংযম' প্রধান মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

এইসকল পার্থক্য কেবল আচরণগত নয়, বরং তা গভীরভাবে লিঙ্গ ও সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত। বিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রে এই ব্রতগুলি গৃহস্থলীর মঙ্গল সাধনের উপায়, কিন্তু বিধবাদের ক্ষেত্রে ব্রত সামাজিক সীমাবদ্ধতা ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম। ফলে এই ব্রতপ্রথা দুই ভিন্ন সামাজিক অবস্থানে দুই ভিন্ন অর্থ ধারণ করে।[৯] এইভাবে বিধবা কেন্দ্রিক ব্রত ও সাধারণ ব্রতের পার্থক্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে ব্রতপ্রথা কোনো একরৈখিক ধর্মীয় আচার নয়, বরং এটি সামাজিক স্তরবিন্যাস, লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা এবং ক্ষমতার সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। হিন্দু ধর্মীয় পরিমণ্ডলে ব্রত বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মেনে উপবাস, সংযম ও আচার পালনের মাধ্যমে ধর্মীয় পুণ্য অর্জনের প্রক্রিয়া। মনুস্মৃতি ও অন্যান্য স্মৃতি শাস্ত্রে নারীদের জন্য বিভিন্ন ব্রতের উল্লেখ থাকলেও বিধবাদের জন্য সংযোগের মাত্রা ছিল তুলনামূলক ভাবে কঠোর। যা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর কামনা, ভোগ ও সামাজিক অংশগ্রহণ সীমিত করার নৈতিক যুক্তি হিসাবে এই ব্রতকে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল।[১০] শাস্ত্রীয় নির্দেশগুলি লক্ষ্য করলে বিধবাদের জীবনকে বৈরাগ্যমুখী করে তোলার প্রবণতা দেখা যায়, যদিও বাস্তবে এই বৈরাগ্য পুরুষের সন্ন্যাসের মতো ছিল না, পরিবর্তে এটি ছিল গৃহস্থ সমাজের ভেতরেই আরোপিত এক আমৃত্যু ব্রহ্মচর্যের ব্রত।

বিধবাদের ব্রত পালনের ক্ষেত্রে খাদ্য সংযম ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠোরতম অনুশীলন। দিনে একবেলা আহার, নির্দিষ্ট তিথিতে নির্জলা উপবাস, নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ এবং লবণ, তেল, মসলা বর্জনের মতো বিধিনিষেধ বিধবাদের শরীরকে নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হয়ে উঠেছিল।[১১] খাদ্য এখানে কেবল পুষ্টির প্রশ্ন ছিলনা, এটি ছিল পবিত্রতার প্রতীক। কম আহার মানেই কম কামনা, এই ধারণা সমাজের অন্তরে গভীর ভাবে প্রথিত ছিল। এই খাদ্যবিধি বিধবাদের ক্রমাগত স্মরণ করিয়ে দিত তাদের সামাজিক অবস্থান ও সমাজ দ্বারা নির্ধারিত নৈতিক সীমানা।[১২] দৈহিক দুর্বলতা, রোগ ও অপুষ্টি ছিল এই সংযমের স্বাভাবিক পরিণতি এবং সেগুলিকে ধর্মীয় পুণ্য অর্জনের পেছনে কৃচ্ছ্রসাধন বলে ঘোষণা করা হতো। বাল্যবিধবা হিন্দুমতী দেবী তার পালনীয় ব্রত সম্পর্কে বলেছেন-

> "একাদশী, অম্বুবাচী, দশুমী, দোয়াদশী, পরাণ, বামুন খাওয়ানো- হাজার রকম উপোস তিরেস সবই থাকত ফি-মাসে। ঠাকুর মশাই ঘন্টা বাজাতে বাজাতে এসে মোক্ষদাকে হাঁক পেড়ে উপোসের কতা শুনিয়ে টাকা নিয়ে যেতেন। একাদশীর আগের দিন দশুমীতে ভাত খাওয়া চলত না, দোয়াদশীতে বামুন খাইয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে তবে চিনির পানা খাওয়া যেত।"[১৩]

ব্রত পালনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে যুক্ত ছিল পোশাক ও শয্যার উপর বিধিনিষেধ। সাদা অনাড়ম্বর পোশাক, অলংকার বর্জন এবং কঠিন শয্যায় শয়ন এই সকল বিধিনিষেধের মধ্যে বিধবাদের শরীরকে সামাজিক ভাবে উপস্থাপিত করা হত এক 'সংযত' ও 'নিষ্কাম' সত্তা হিসেবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ এই যে কঠিন সংযম তা স্বেচ্ছায় গৃহীত সন্ন্যাসের মতো ছিল না, এটি ছিল সামাজিক প্রত্যাশা দ্বারা আরোপিত এক আমৃত্যু স্থায়ী ব্রহ্মচর্যের ব্রত। বিধবাদের জীবনে কিছু নির্দিষ্ট ব্রতগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে একাদশী ব্রত হল সবচেয়ে কঠিন ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বৈষ্ণব প্রভাবিত বাংলা সমাজে একাদশী ব্রত পালন ছিল বাধ্যতামূল। প্রতি বাংলা মাসের দুই একাদশী তিথিতে এই ব্রত পালন করতে হত। একাদশী ব্রতকথা অনুযায়ী এই তিথিতে নির্জলা উপবাস করলে পূর্বপুরুষের আত্মা তৃপ্ত হয় এবং ব্রতীর মোক্ষ লাভ হয়। অমৃতলাল বসু তার 'অমৃত-মদিরা' গ্রন্থে 'বালবিধবা' কবিতায় তুলে ধরেছেন তার মা ছাব্বিশ বছর বয়সে বিধবা হন এবং সেই মাসেই কিছুদিন বাদে তার কলেরা রোগ হয়, এই অবস্থায় সদ্য বিধবার জৈষ্ঠ মাসের গরমের মধ্যে নির্জলা একাদশী ব্রত পালনের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন-

"পুরাণের কোন্ দেবী এত শক্তি ধরে।
জ্যেষ্ঠমাসে একাদশী জল বিনা করে।।
সমস্ত শরীরসুখ হেঁসে বলিদান।
লজ্জায় পালায় কাম ফেলে ফুলবান।।
.....
নগরে নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ দিবা দ্বিপ্রহর।
বিসুচিকা-তৃষ্ণা তাতে কত ভয়ঙ্কর।।
শক্তি বুঝিবারে বুঝি সদ্যোবিধবার।
সেইদিন একাদশী পড়েছে আবার।।
মা আমার ছটপট্ করেন মাটাতে।
বাটীর সকল বুক লাগিল ফাটিত।।
.....
উড়িল ব্যবস্থাপত্র বাতাসে উঠানে।
কাকীমা জলের ফোঁটা দেন মার কানে।।
আমি কেঁদে বলি পাপ আমারে চাপাও।
মা আমার এক-ঢোঁক জল তুমি খাও।।
.....
পাথরে রাখিয়া জল উদরে বসায়।
জননী জীবন পান ঈশরকৃপায়।।
"বড়ই নৃশংস এই কসাই-আচার।
তলায় থিতোনো কাদা বর্ব্বর প্রথার"।।"[১৪]

এই কবিতার মাধ্যমে কবি একাদশী ব্রতের কঠিন নির্মমতাকে তুলে ধরেছেন। বিধবাদের অবশ্য পালনীয় এই একাদশী ব্রতকে সমালোচনা করে কবি যথার্থই একে বর্বর প্রথা বলে উল্লেখ করেছেন। একাদশী ব্রতের করুণ পরিণতির একটি ঘটনা, অধ্যাপিকা সুমিতা মিত্র তার মায়ের কাছ থেকে শুনে ছিলেন- এক চোদ্দ বছরের গর্ভবতী মেয়ে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি চলে আসেন। বাপের বাড়ির পুকুরে বারোমাস স্নান করলেও একাদশীর দিন তাকে কিছুতেই পুকুরে যেতে দেওয়া হতনা, বাড়িতে জল তুলে তাকে স্নান সারতে হত। বাড়ির লোকের ভয় ছিল যদি মেয়ে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে গোপনে জল খেয়ে ব্রতভঙ্গ করে তবে তার নরকবাস হবে। মেয়ের স্নানের সময় বাড়ির ঝিকে দিয়ে নজর রাখা হত। অদৃষ্টের করুন পরিহাসে গ্রীষ্মের একাদশীর রাত্রিতেই তার প্রসববেদনা ওঠে, আর তখন সে একটু জলের জন্য ছটফট করতে থাকে। বারবার জল চাইলেও আগামী জন্মে মেয়ের বৈধব্য হবে এই আশঙ্কা করে মা জল দিতে পারেননি। দ্বাদশীর সকালে মেয়েটি একটি মৃত পুত্র-সন্তান প্রসব করে।[১৫]

এই সকল ঘটনাগুলি প্রমাণ করে এই সকল ব্রতপ্রথার ফলে বিধবাদের কি করুন পরিণতির সম্মুখীন হতে হত। নরকবাস, পরজন্মের বৈধব্যের ভয় ও মৃত স্বামীর আত্মার শান্তির জন্য কৃচ্ছসসাধন। সামাজপতিরা আশ্বাস দেয় যে তার কষ্টের মধ্যেই স্বামীর পরলৌকিক মঙ্গল নিহিত ও এই দিন অন্ন গ্রহণ করলে তা 'পাপ' ভক্ষণের সমান হবে। এই সকল ধর্মীয় ভয়ই বিধবাদের নির্জলা উপবাস করতে বাধ্য করত। এটি ছিল মূলত বিধবাদের শরীরকে শোষণ করার একটি প্রক্রিয়া।

বাঙালি হিন্দু শাক্ত ধর্মে বিশ্বাসী বিধবাদের কাছে অম্বুবাচী ব্রত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আষাঢ় মাসের সপ্তম দিনে সূর্য যখন মৈথুন রাশিতে প্রবেশ করে তখন থেকেই এই ব্রত শুরু হয় যা পরপর তিন দিন ধরে চলে। প্রত্যেক বছর আষাঢ়ের সাত তারিখ অম্বুবাচী শুরু হয় তাই প্রবাদ আছে- "সাতই আষাঢ় অম্বুবাচী, নেই কোনো তার পাঁজি পুঁথি।"[১৬] লোকের বিশ্বাস যে অম্বুবাচীর তিন দিন বসুমতি রাজস্বলা হন বলে সেই দিনগুলিতে তিনি অশুচি থাকেন। বিধবা নারীরা এই সময় উপবাস করেন, সজ্জা ছেড়ে মাটিতে পা দেন না। ব্রতীরা এই সময় তিন দিন উনুন জ্বালেন না এবং কোন রান্না করা খাবার খাননা, তারা কাঁচা খাবার অর্থাৎ আম, সাবু, কাঁচা দুধ, শুকনো ফল ইত্যাদি খান। এই তিন দিন অতিক্রান্ত হলে চতুর্থ দিনে ধরিত্রী শুদ্ধ হলে ব্রত সাঙ্গ করে স্নান সেরে স্বাভাবিক আহারে ফিরে আসা যায় এবং প্রত্যেকটি বাড়ি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়, বাড়ির সমস্ত জামা-কাপড়ও ধোয়া হয় অর্থাৎ সবকিছুকেই পুনরায় শুচি করা হয়।[১৭]

অম্বুবাচীকে পৃথিবীর ঋতুকাল হিসেবে দেখা হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ঋতুস্রাবকে 'অশুচি' বা 'অপবিত্র' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিধবাদের যেহেতু আমৃত্যু ব্রহ্মচর্যের ব্রত পালন করতে হয় তাই তাদের শরীরকে 'নিষ্কাম' ও 'নিষ্ক্রিয়' করে রাখতে উর্বরতার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে এই কঠিন ব্রত পালন করতে হয়।[১৮] অম্বুবাচী উৎসবের মূল সুরটি উর্বরতা ও প্রকৃতির বন্দনা হলেও এই ব্রত পালনের পেছনে বিধবাদের ওপর কৃচ্ছসাধনের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিচারে স্পষ্টতই একটি লিঙ্গ বৈষম্যের উদাহরণ।

মাঘ মাসে 'মাঘ স্নান' ও মৌনী অমাবস্যার ব্রত পালন বিধবাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই ক্ষেত্রেই সংযম, উপবাস ও নীরবতা (মৌনতা পালন) গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত মৌনী অমাবস্যার দিনে গঙ্গা অথবা যেকোন পবিত্র নদীতে স্নান করে সারাদিন মৌন থাকা ও স্বল্প আহার গ্রহণ করতে হয়। শুধু মৌন নয় অন্তরের কামনা ও বাসনার শব্দকে বন্ধ করে অন্তরে বাহিরে মৌন থাকা। বিধবাদের ক্ষেত্রে এই ব্রত তাদের সামাজিক নীরবতার প্রতীক, যেখানে ধর্মীয় নীরবতা ও সামাজিক নীরবতা একে অপরের সঙ্গে মিশে যায়।

এই সকল ব্রতগুলির পাশাপাশি বিধবারা সধবাদের সঙ্গে বেশকিছু যৌথ ব্রত পালন করতেন। যেমন মঙ্গল চন্ডী, নাগ পঞ্চমী, তালনবমী, হরির চরণ, জন্মাষ্টমী, শিব চতুর্দশী, ভৈমী একাদশী, মনসা, বিপত্তারিণী প্রভৃতি।[১৯] বিধবাদের ব্রত পালন কেবল বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় আচার নয়, এটি তারচেয়ে অনেক বৃহৎ এক সামাজিক কাঠামো। উনবিংশ শতকের ব্রাহ্মণ্য ভদ্রলোক সমাজে ব্রহ্মচর্য বা আজীবন সংযমকে বিধবার 'আদর্শ জীবন' হিসেবে চিত্রায়ীত করা হয়েছে, যেখানে ব্রত, উপবাস ও দৈহিক নিয়ন্ত্রণের আদর্শকে দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়ীত করা হয়েছে।[২০]

ঔপনিবেশিক আধুনিক শিক্ষার ফলে বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পরিমণ্ডল তৈরি হতে থাকে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর মত ব্যক্তিরা এবং নব্যবঙ্গ ও ব্রহ্ম সমাজের মতো সংগঠনগুলি বিধবাদের দুরাবস্থা নিয়ে সমালোচনা শুরু করেন। তাঁরা শাস্ত্র, যুক্তি ও মানবিকতার সমন্বয়ে বিধবা বিবাহ ও সামাজিক সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করেন, তবে বিধবাদের কঠোর ব্রত পালনের প্রশ্নটি প্রায়শই তাদের কাছে গৌণ থেকে যায়।[২১] রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াসে সতীদাহ প্রথা রদ হওয়ার ফলে জীবিত বিধবাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কৌলিন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি প্রথার ফলে সমাজে তাদের উপস্থিতি ক্রমশ দৃশ্যমান হয় এবং এই একই সঙ্গে তাদের উপর উপবাস, নিরামিষ আহার গ্রহণ, ব্রত পালন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ মূলক আচার আরো কঠোরভাবে আরোপ করা হয় যাতে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে। সমাজপতিদের ভয় ছিল বিধবারা যদি এই ব্রত পালন ও কঠিন ত্যাগের জীবন না গ্রহণ করেন তাহলে সম্পত্তির ওপর তাদের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে তাদের সংসার ত্যাগী ব্রতী

হিসেবে তুলে ধরা হত।[২২] এটিও ছিল ব্রত প্রচারের পেছনে একটি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর বিধবাদের উপর আরোপিত কঠিন শাস্ত্রীয় কৃচ্ছসাধনের ধারণার ওপর প্রথম বড় আঘাত হানেন। বিদ্যাসাগর যুক্তি ও শাস্ত্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে জোরপূর্বক সংযম আরোপ মানবিকতার পরিপন্থী। এই সময় স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের ফলে অন্দরমহলের ভেতরে থাকা বিধবারা ব্রতপ্রথার পৌরাণিক বয়ানের বাইরে বেরিয়ে এসে যুক্তিবাদী চিন্তা এবং আধুনিক শিক্ষার দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এর ফলে কঠিন ব্রত পালনের বাধ্যবাধকতা কিছুটা প্রশ্নের মুখে পড়ে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে নারী শিক্ষার প্রসার, নগরায়, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পুষ্টিবিজ্ঞানের প্রভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি হতে থাকে বিধবাদের একবেলা আহার নিয়মিত নির্জলা উপবাস বিভিন্ন ব্রত পালনের সময় অন্ন বর্জন প্রভৃতি বিধান দীর্ঘকাল টিকে থাকলেও ক্রমে শহুরে বিধবারা প্রচলিত কঠিন ব্রত পালনের বেড়াজালকে নিরবে অতিক্রম করতে থাকেন- মাছ খাওয়া পুনরাম্ভ, উপবাস শিথিল করা ইত্যাদির মাধ্যমে।[২৩] ক্রমে কঠিন ব্রত পালনকারীর সংখ্যা শহরাঞ্চলে ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে এবং গ্রামীণ জীবনে এটি একটি 'লোকজ সংস্কৃতি' হিসেবে টিকে রয়েছে। নাগরিক আধুনিকতার প্রসারের সাথে সাথে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে অনু-পরিবারের প্রসার ঘটতে থাকে। যার ফলে বিধবাদের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাঠামো ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। পরিবার ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়ায় ব্রত পালনের বাধ্যবাধকতা ও আংশিকভাবে কমতে থাকে।

উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাদের মধ্যে এই ব্রত পালনের কঠোরতা যতটা ছিল নিম্ন বর্ণের বিধবাদের মধ্যে তা তুলনামূলক ভাবে শিথিল ছিল। উনবিংশ শতকের শেষভাগে সংস্কৃতায়নের ফলে বহু নিম্ন ও মধ্যবর্তী জাতি উচ্চবর্ণীয় বিধবাদের সংযমের আদর্শ গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে ব্রতপ্রথা শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ্য আচার থেকে বিস্তার ঘটে সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়।[২৪] অনেক ক্ষেত্রে পরিবার নিজেদের সমাজে উঁচুতে তুলতে নিজেদের বাড়ির বিধবাদের ওপর শাস্ত্রীয় কঠোরতা বৃদ্ধি করতে শুরু করে ফলে বিধবাদের কঠিন তপসামুলক জীবনধারা পরিবারের নৈতিক মানদন্ড ও সামাজিক মর্যাদাকে সমাজের প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পরিণত হয়ে উঠেছিল।[২৫]

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের সর্বক্ষণের একাকীত্ব, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে নিয়মিত ব্রত পালন, উপবাস ও পূজা-অর্চনা তাদের জীবনের নতুন অর্থ ও লক্ষ স্থির করে দেয় এবং তাদের এক আধ্যাত্মিক আশ্রয় প্রদান করে। তাই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্রতপ্রথা ও ধর্মীয় আচারগুলি পালনের মাধ্যমে নিজেকে ঈশ্বরের চরণে সোপে দিয়ে এক ধরনের মানসিক শান্তি ও সুরক্ষাবোধ লাভ করত।[২৬] এই আত্মত্যাগ ও ঈশ্বরসেবা তাদের মনের মধ্যে পবিত্রতা বোধ গড়ে তোলে, যা তাদের কাছে আত্মগৌরব ও আত্মপরিচিতির একমাত্র পথে পরিণত হয়। তার নিজের কষ্টকে ঈশ্বরের সেবা বলে মনেকরে আত্মনিপীড়নের মধ্যেই আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করতেন। এটি পিতৃতন্ত্রের এক বিশেষ জয়, যেখানে শোষিত নিজেই শোষণের দড়িকে ধর্ম মনে করে গলায় পরে নিতেন।

বাঙালি নারী ইতিহাসের একটি দীর্ঘ যন্ত্রণাময় অধ্যায় হল এই বিধবা কেন্দ্রিক ব্রতপ্রথাগুলি। যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে বিধবাদের জীবনানুভূতি, ধর্মীয় আচার ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক জটিল সাংস্কৃতিক ইতিহাস। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিধবা ব্রতগুলিকে দেখলে এক অদ্ভুত দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে একদিকে এটি একটি শোষণের হাতিয়ার, আবার অপরদিকে এটি বহু বিধবাদের কাছে চরম একাকীত্ব ও অনিশ্চয়তার মাঝে বেঁচে থাকার একমাত্র আধ্যাত্মিক আশ্রয় ও মানসিক নিরাপত্তা বোধের উৎস। তাই এটি পিতৃতন্ত্রের এমন এক সুক্ষ্ম জয়, যেখানে শোষিত নিজেই তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলকে ধর্মের পবিত্র প্রলেপ দিয়ে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। ব্রত কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় বিধান নয়, এটি একটি সামাজিক

ব্যবস্থা যা সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়ে আজও সমাজের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের পদচিহ্ন বহন করে চলেছে। এই কারণে বিধবাদের ব্রতপ্রথার বিশ্লেষণ বাংলার সামাজিক ইতিহাস, লিঙ্গ, সমাজতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত গতিশীলতা বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

[১] ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। বাংলার ব্রত। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, পৃ. ৫।

[২] বসাক, শীলা। বাংলার ব্রতপার্বণ। পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ. ২।

[৩] বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সংকলক)। সংসদ বাংলা অভিধান। সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৭, কলকাতা, পৃ. ৬৫১।

[৪] Chakrabarti, Aisika. Widowhood in Colonial Bengal 1850-1930. PhD diss., University of Calcutta, 2004, pp. 8-12.

[৫] বসাক, শীলা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

[৬] ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬।

[৭] বসাক, শীলা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

[৮] দত্ত, কল্যানী। পিঞ্জরে বসিয়া। স্ত্রী, ১৯৯৬, কলকাতা, পৃ. ১৩।

[৯] Sarkar, Tanika. Hindu wife, Hindu nation: community, religion, and cultural nationalism. Permanent Black, 2001, pp. 41-43.

[১০] Mani, Lata. Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India. University of California Press, 1998, pp. 51-53.

[১১] Chatterjee, Ananya. The Bengali Widow's Kitchen: Looking Back at an Obscure Legacy. New Literaria- An International Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 4, No. 1, January-February 2023, pp. 32.

[১২] Banerji, Chitrita. The Hour of the Goddess: Memories of Women, Food, and Ritual in Bengal. Penguin Books, 2006, pp. 95-104.

[১৩] দত্ত, কল্যানী। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

[১৪] বসু, অমৃতলাল। অমৃত-মদিরা। বেঙ্গল মেডিক্যাল্ লাইব্রেবী, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ১০৯-১১৭।

[১৫] দত্ত, কল্যানী। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।

[১৬] চট্টোপাধ্যায়, ত্রিদিবকুমার। বাংলার প্রবাদ। পত্র ভারতী, ২০০০, কলকাতা, পৃ: ১৫৩।

[১৭] বসাক, শীলা। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

[১৮] Sarkar, Tanika. op. cit., pp. 52-55.

[১৯] বসাক, শীলা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

[২০] Chakrabarti, Aisika. op. cit., pp. 224-230.

[২১] Zafar, Manmay. Social Reform in Colonial Bengal: Revisiting Vidyasagar. Philosophy and Progress, V0l. LV-LVI, January-December, 2014, pp. 110-111.

[২২] Chakravarti, Uma. Gender, Caste and Labour: Ideological and Material Structure of Widowhood. Economic and Political Weekly, Vol. 30, no. 36, 9 September 1995, pp. 2248-2249.

[২৩] Banerji, Chitrita. op. cit., pp. 101-102.

[২৪] Chakrabarti, Aisika. op. cit., pp. 11-13

[২৫] Sarkar, Tanika. A Prehistory of Rights: The Age of Consent Debate in Colonial Bengal. Feminist Studies, Vol. 26, no. 3, 2000, pp. 617-620.

[২৬] Chakrabarti, Aisika. op. cit., pp. 224-230